অতীব গোপনীয়

সুনামগঞ্জসহ আগাম বন্যায় প্লাবিত অন্যান্য জেলার হাওর রক্ষা বাঁধের নির্মাণ ও সংস্কার কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ধীরগতি সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ তদন্তের তদন্ত প্রতিবেদন।

ভূমিকা

সুনামগঞ্জ ধানের দেশ, একই সাথে গানের দেশ। শুধু সুনামগঞ্জ নয়, হাওর অধ্যুষিত সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনাসহ ৬টি জেলাই এই বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত কবি রাধারমণ দত্ত লিখেছিলেন 'কারে দেখাব মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া/অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া।' গত বছর তাঁর শততম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে, আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে মরমি গান না লিখে ফসলহানির গান লিখেতেন। কারণ, এ বছর হাওর অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে, ফসলহানির মাতম, বিগত অর্ধ শতাব্দীতে যা ঘটেনি, এবার তেমনটি ঘটেছে, কারো ঘরে এক মুষ্ঠি ধানও উঠেনি। যেখান থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রাষ্ট্রের শস্যাগারে জমা হবার কথা, সেখানে রাষ্ট্রের শস্যাগার থেকে খাদ্য সরবরাহ করতে হচ্ছে দুর্গত মানুষের সহায়তার জন্য। বিষয়টি সরকারের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে বিবেচিত হয়েছে। ইতোমধ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরেজমিনে হাওর এলাকা পরিদর্শন করেছেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে (পরিশিষ্ট-১)। পরবর্তী সময়ে কমিটিতে আরো ২ (দুই) জন সদস্য যুক্ত করা হয় (পরিশিষ্ট-২)। কমিটির প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয় ১১ জুন ২০১৭ পর্যন্ত (পরিশিষ্ট-৩)। এই তদন্ত কমিটি ৬টি জেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ডাটা বিশ্লেষণ করে আলোচ্য প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

১.২ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওরসমূহ অনেকটা তস্তরী (সসার) আকৃতির (পরিশিষ্ট-৪, মানচিত্র)। সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় ৩৭৩ টি হাওর যার আয়তন প্রায় ৮৫৮৪৬০ হেক্টর (তথ্যের উৎস: Master Plan of Haor Area -Volume-1)। হাওর অঞ্চলসমূহে সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে বিভিন্ন শস্য চাষ এবং বর্ষাকালে মৎস্য চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের এ সকল হাওরসমূহ বরাবরই খাদ্য শস্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। হাওর অঞ্চলসমূহে সাধারণত বোরো শস্য ডিসেম্বর হতে মে পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। অকাল বন্যার কবল থেকে ফসল রক্ষা এবং শীতকালে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্য ৬টি জেলায় ৬৬টি হাওরের চতুর্দিকে ১৯৬২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ডুবন্ত বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করে আসছে। এ বাঁধের টপ লেভেল সর্বনিম্ন ৬.৫ mPWD। হাওরের নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষা, হাওরের Ecology, Bio-diversity, পরিবেশ এবং মৎস্য সম্পদের উপর প্রভাব বিবেচনা করেই এ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ সকল বাঁধ বর্ষা মৌসুমে পানিতে ডুবে থাকা এবং শুস্ক মৌসুমে জেগে উঠার কারণে প্রতি বছরই প্রকৃতিগত এবং মানবসৃষ্ট কারণে কোন না কোন স্থানে ভেঙ্গে যায় অথবা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শুস্ক মৌসুমে বোরো ধান চাষের শুরুতেই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্থ অংশের মেরামতের কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং আগাম বন্যা আসার পূর্বেই মেরামত কাজ শেষ করা হয়। আগাম বন্যা সাধারণত মে'র মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

১.৩ বিগত সময়কালে হাওর এলাকার আগাম বন্যা

১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০১০, ২০১৭ সালে আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে সুনামগঞ্জসহ দেশের অন্যান্য হাওর এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। তন্মধ্যে ২০০৪, ২০১০ এবং ২০১৭ সালে সুনামগঞ্জ এলাকায় পানির সমতল যথাক্রমে ৮.০৮, ৮.০৫ ও ৮.০৯ (mPWD) রেকর্ড করা হয়েছে (সূত্রঃ বাপাউবো)। হাওর অঞ্চলসমূহে ফসলের ক্ষতি দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়ে থাকে। যথা ঃ ক) প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুণ বাঁধবেষ্টিত হাওর এলাকায় ফসলের ক্ষেত পানিতে নিমজ্জিত হওয়া, খ) পাহাড়ি ঢলের ফলে বাঁধ ভেঙ্গে হাওরে পানি প্রবেশ অথবা বাঁধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে হাওরের ফসলকে ডুবিয়ে দেওয়া।

সুনামগঞ্জে সর্বোচ্চ পানি সমতল (মার্চ-এপ্রিল) ঃ

বছর	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০
পানি সমতল (mPWD)	৬.১৪	৬.৯৩	৫.২০	৮.০৮	৫.৪২	৫.৩৫	৫.৭৮	৪.৪২	৫.০৭	৮.০৫
বছর	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭			
পানি সমতল (mPWD)	৬.০৮	৬.২৮	৩.০৩	২.৬৭	-	৭.৫৬	৮.০৯			

সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৭ সালে বিভিন্ন হাওরের বাঁধের টপ লেভেল, পানি সমতল, বৃষ্টিপাত ও বাঁধের উপর দিয়ে পানি overtop সংক্রান্ত তথ্য পরিশিষ্ট-৫ এ সন্নিবেশিত করা হলো।

১.৪ পানি বৃদ্ধির সাথে বাঁধ ডুবে যাওয়ার তথ্য

এ বছর ২৯ মার্চ হতে ৫ এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত আসামের চেরাপুঞ্জিতে ১১৮৪.৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। চেরাপুঞ্জি হতে সুনামগঞ্জের দূরত্ব প্রায় ২২ কি.মি.। অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ট এই জলরাশি খুব দ্রুত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এছাড়া, একই সময়ে বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৯০ মিলিমিটার এবং সিলেট জেলায় ৬৫৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে পানির উচ্চতা ছিল ২.৪০ mPWD। ১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে তা বেড়ে ৭.০৬ mPWD-তে উন্নীত হয়। অর্থাৎ চার দিনে পানির উচ্চতা ৪.৬৬ মি. বৃদ্ধি পায়। ফলে বিভিন্ন হাওরে বাঁধ টপকে পানি গড়িয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০১৭ খ্রিঃ (২৯ মার্চ হতে ০১ এপ্রিল) এ আকস্মিৎ বন্যায় সুনামগঞ্জ জেলায় ডুবন্ত বাঁধের সাথে পানি সমতল বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

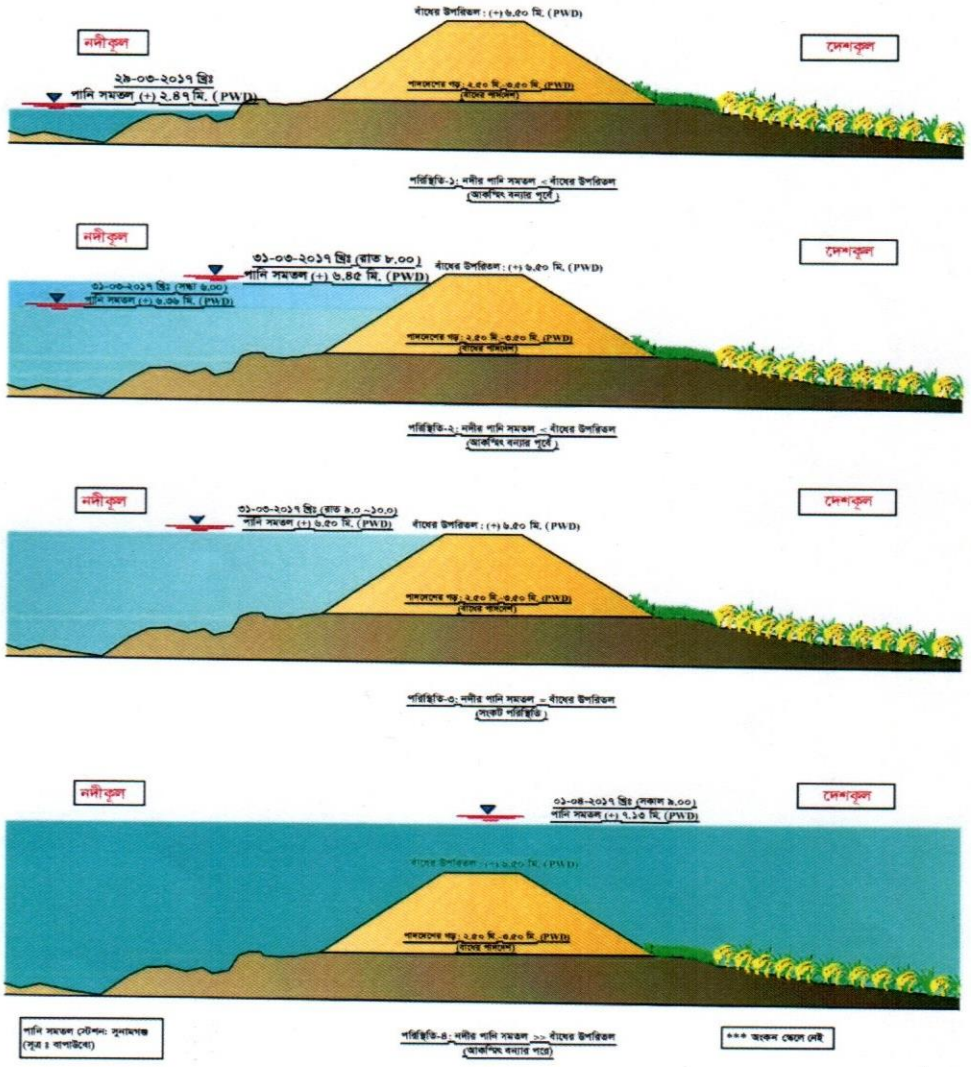

২.০ তদন্ত কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি

সুনামগঞ্জসহ আগাম বন্যায় প্লাবিত অন্যান্য জেলার হাওর রক্ষা বাঁধের নির্মাণ ও সংস্কার কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ধীরগতি সংক্রান্ত গুরুতর অভিযোগ তদন্তের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩১.২৭.০২৯.১৬-

৩৫২ তারিখঃ ৩০ এপ্রিল ২০১৭ এবং স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৩১.২৭.০২৯.১৬-৩৬৬ তারিখঃ ৮ মে ২০১৭ মোতাবেক গঠিত, তদন্ত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

ক) সুনামগঞ্জসহ আগাম বন্যায় প্লাবিত অন্যান্য জেলার হাওর রক্ষা বাঁধের নির্মাণ ও সংস্কার কাজে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ধীরগতি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার কারণ খুঁজে বের করা।

খ) উক্ত কাজে যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করা।

গ) আগাম বন্যা হতে হাওর এলাকার ফসল রক্ষার বিষয়ে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

৩.০ তদন্ত কমিটির কার্যক্রম

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপরিধি (TOR)-এর আলোকেই তদন্ত কমিটি তাঁর কার্যক্রম পরিচালিত করে। TOR-এর বাইরের কোন বিষয় এই প্রতিবেদনে যাতে অন্তর্ভুক্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ ০৩ মে ২০১৭ তারিখে আহবায়কের কার্যালয়ে এক সভায় মিলিত হন এবং তদন্ত কাজের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। একই দিন কমিটির সদস্যগণ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়-এর সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি সুনামগঞ্জ থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য। অতঃপর বিগত ০৭ মে ২০১৭ হতে ০৯ মে ২০১৭ পর্যন্ত সুনামগঞ্জ অঞ্চলের হাওরসমূহ পরিদর্শনের পাশাপাশি জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় এলাকাবাসী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ পরিদর্শন এবং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসনের সাথে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং জেলা প্রশাসন প্রণীত একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয় (পরিশিষ্ট-৬)। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে প্রতিবেদন ছাড়াও বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী ও চিঠিপত্র (পরিশিষ্ট-৭) ও আলোকচিত্র (পরিশিষ্ট-৮) সংগ্রহ করা হয়।

৩.২ দ্বিতীয় পর্যায়ে কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক ১২ মে ২০১৭ হতে ১৭ মে ২০১৭ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নেত্রকোনা,কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট অঞ্চলের হাওরসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়, জেলা প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং স্থানীয় এলাকাবাসী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সিলেটে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পওর বিভাগ সদর দপ্তর পরিদর্শন এবং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। এই পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সুনামগঞ্জসহ ৬টি জেলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-৯ এ সন্নিবেশিত আছে।

৩.৩ বিগত ১৪.০৫.২০১৭ তারিখে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, সিলেটসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচ্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয় (পরিশিষ্ট-১০)।

৩.৪ বিগত ১৮ মে ২০১৭ তারিখে জনাব আব্দুল হাই, প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), জনাব নুরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) এবং জনাব আবছার উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)-এর বক্তব্য মতিঝিলস্থ প্রকল্প অফিসে বসে গ্রহণ করা হয় (পরিশিষ্ট-১১)। এছাড়া হাওরের সমস্যা ও সমাধান এর উপর IWM (Institute of Water Modelling) ও CEGIS (Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)-এ কর্মরত পানি বিশেষজ্ঞগণের সাথে স্ব স্ব কার্যালয়ে আলোচনা করা হয় ও তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৩.৫ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ ও মৌলভীবাজার জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শাহাবুদ্দীন আহমদ-এর সাথে জাতীয় সংসদ ভবনে তাঁর অফিসকক্ষে মতবিনিময় করা হয়। তিনি দু'টি ডি.ও. লেটারের কপি কমিটিকে দেন (পরিশিষ্ট-১২)। এছাড়া মাননীয় সংসদ সদস্য (কিশোরগঞ্জ-৪) জনাব রেজওয়ান আহম্মেদ তৌফিক-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মতামত গ্রহণ করা হয়।

সর্বশেষ বিগত ০৩.০৬.২০১৭ তারিখে পানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আইনুন নিশাত ও বুয়েটের অধ্যাপক উম্মে কুলসুম নভেরা'র মতামত গ্রহণ করা হয়।

৪.০ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিয়ে তদন্ত কমিটি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৪.১ হাওর অঞ্চলে আগাম বন্যার কবল হতে ফসল রক্ষার জন্য মূলত: দুই ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি হল কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)-এর আওতায় প্রজেক্ট ইম্প্লিমেন্টেশন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। অন্যটি হলো এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প-এর আওতায় ঠিকাদারদের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

৪.২ কাবিটার কার্যক্রম

ষাটের দশক হতে হাওর এলাকার ফসলকে আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষার জন্য ডুবন্ত বাঁধ নির্মিত হয়ে আসছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ০৬ (ছয়) টি জেলার ৩৭৬টি পিআইসি'র মাধ্যমে কাবিটার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় (সুনামগঞ্জে-২৩৯টি, হবিগঞ্জে-৩৯টি, সিলেটে-৩৩টি, মৌলভীবাজারে-৮টি, নেত্রকোনায়-৪১টি ও কিশোরগঞ্জে-১৬টি)। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০১০ (পরিশিষ্ট-১৩) মোতাবেক প্রতিটি পিআইসি ৫-৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিটিতে ১ জন সভাপতি, ১ জন সদস্য-সচিব এবং অন্যরা সদস্য হিসাবে থাকেন।

৪.২.১ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩০ নভেম্বর তারিখ-এর মধ্যে পিআইসি-র গঠন সমাপ্ত করতে হবে এবং ১৫ ডিসেম্বর এর মধ্যে কাজ শুরু করে আবশ্যিকভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ সমাপ্ত না করতে পারলে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে। পিআইসি-র কার্যক্রম মনিটরিং-এর মূল দায়িত্ব মাঠপর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলী কাজের নিয়মিত তদারকি করবেন। উপজেলা ও জেলা কমিটির সভাপতি হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকও প্রকল্প কাজ তদারকি করতে পারেন। কমিটির সদস্যবৃন্দও কাজ পরিদর্শন করতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রধানের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেন। এছাড়া বাপাউবো'র প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) কেন্দ্রীয়ভাবে কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কাবিটা কর্মসূচীর সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.২ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী (বাপাউবো) কৃত কাজের বিল পরিশোধ করেন। ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে সুনামগঞ্জ জেলার ২৩৯টি পিআইসি'র কাজের অনুকূলে পরিশোধকৃত বিলের পরিমাণ ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। জেলাওয়ারী কাবিটার আওতায় পিআইসি-এর গঠন ও অনুমোদন, অগ্রগতি এবং বিল পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১৪ এ সংযোজন করা হলো। এই তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় ধীরগতি ও সময়মত কাজ সম্পন্ন না হওয়ার যে চিত্র পাওয়া যায় যা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। হাওর এলাকায় কাজ বাস্তবায়নের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন- পানি না শুকানোয় ১৫ ডিসেম্বর-এর পূর্বে কাজ শুরু করা যায় না, আবার বন্যা আসার পূর্বেই কাজ শেষ করতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হলে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হয়। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই বিশেষ ব্যবস্থা যা সম্পূর্ণভাবে Time Bound, তার জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। সরেজমিনে তদন্তকালে ৬টি জেলার পিআইসি গঠনের যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো ঃ সুনামগঞ্জ জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দের নিকট হতে ২৩৯ টি পিআইসি'র মধ্যে নামের তালিকা পাওয়া যায় ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে ১৩৭ টির, ১-১৫ জানুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে ৫ টির, ১৬-৩১ জানুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে ৯৩ টির এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে ৪ টির। সিলেট জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দের নিকট হতে ৩৩ টি পিআইসি'র মধ্যে নামের তালিকা পাওয়া যায় নভেম্বর ২০১৬ মাসে ৩ টির, ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে ১৭টির, জানুয়ারি ২০১৭ মাসে ১২ টির এবং মার্চ মাসে ১ টির। হবিগঞ্জ জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দের নিকট হতে ৩৯ টি পিআইসি'র মধ্যে নামের তালিকা পাওয়া যায় অক্টোবর ২০১৬ মাসে ১৮ টির, নভেম্বরে ২০ টির এবং ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে ১টির। নেত্রকোণা জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দের নিকট হতে ৪১ টি পিআইসি'র মধ্যে নামের তালিকা পাওয়া যায় ডিসেম্বর ২০১৬ মাসে ৪ টির, ৪

জানুয়ারি ২০১৭ তে ৬টির এবং ২২-২৬ জানুয়ারি ২০১৭ এর মধ্যে ৩১ টির এবং কিশোরগঞ্জ জেলার মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যানবৃন্দের নিকট হতে ১৬ টি পিআইসি'র মধ্যে নামের তালিকা পাওয়া যায় ১-২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তে ৭ টির, ৮ জানুয়ারি ২০১৭ তে ১ টির, ২-২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তে ৭টির এবং ০১ মার্চ ২০১৭ তে ১ টির। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমান নীতিমালাটি পুনঃপরীক্ষা (Re-Visit) প্রয়োজন।

৪.৩ কাবিটার কার্যক্রম সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত ও অভিযোগ

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে বিভিন্ন হাওরের কাবিটা'র আওতায় পিআইসি-কর্তৃক সম্পাদিত কাজের উপর সুশীল সমাজ ও হাওর এলাকার জনসাধারণের মাধ্যমে যে সকল অভিযোগ ও মতামত পাওয়া যায়, তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ-

ক) কাবিটার আওতায় পিআইসি'র কাজ কোন বছরই সময় মত শুরু হয় না এবং শেষ হয় না।

খ) ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন হয় না এবং ডিজাইন সম্পর্কে সুশীল সমাজ ও জনসাধারণকে ধারণা দেয়া হয় না।

গ) বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে কোন কম্পেকশন করা হয় না।

ঘ) বাঁধে কোন ঘাস লাগানো হয় না।

ঙ) কোন রকমে সরু আকারের বাঁধ দিয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পানি ঠেকানোর চেষ্টা করা হয় এবং ফসল উঠে গেলে যখন বাঁধ ডুবে যায় তখন শতভাগ বিল করে টাকা ভাগাভাগি করা হয়।

চ) পিআইসি-র মাধ্যমে রিসেকশনিং-এর নামে যেখানে বাঁধের সেকশন ভাল থাকে সেখানেই কাজ নেয়া হয় এবং বাঁধের ঘাস চেছে মাটি কুপিয়ে চাকা ভেঙ্গে দেখানো হয় মাটি ফেলেছে। বাস্তবে কোন মাটি ফেলা হয় না, বরং ভাল বাঁধকে আরো দুর্বল করা হয়।

ছ) পিআইসি-র মাধ্যমে রিসেকশনিং-এর যে কাজ করা হয় তাতে সেকশন ডিজাইন অনুযায়ী না করা, কম্পেকশন না করা এবং ঘাস না লাগানোর কারণে বর্ষা শেষে সমস্ত লুজ মাটি ধুঁয়ে যায় এবং বাঁধের লেভেল নিচু হয়ে আবার পূর্বের অবস্থায়ই ফিরে আসে। মাঝখানে সরকারি অর্থের অপচয় হয়।

জ) দীর্ঘদিন যাবত পানি উন্নয়ন বোর্ডের একই বিভাগে কর্মরত থাকা শাখা কর্মকর্তাগণ (এসও) অনিয়ম করে নিজেরাই পিআইসি-র কাজ বাস্তবায়ন করেন এবং তারাই ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পিআইসি গঠনের নীতিমালায় পরিবর্তন করা একান্ত জরুরী বলে স্থানীয় জনগণ ও সুশীল সমাজ জানান।

ঝ) পিআইসি গঠনে যার জমি আছে তাদের মধ্য থেকে কৃষকদের নিয়ে কমিটি গঠন করলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে। 'জমি যার বাঁধ তার' এই শ্লোগানের পক্ষে তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

৪.৪ টেন্ডারের মাধ্যমে কার্যক্রম

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিশিষ্ট-১৫ তে দেয়া হলো। উল্লেখ্য, "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৭০৪.০৭ কোটি টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-২০১২ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৪৮.২৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলার (সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ) ৫২টি হাওরে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

ক) ১৯১৯.৪২ কি.মি. ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ১৪৭.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪২৩.০৬ কি.মি.)

খ) ৩২ কি.মি. কম্পার্টমেন্টাল ডাইক (সিলেট জেলায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২ কি.মি.)

গ) ১টি ক্রসবাঁধ (সুনামগঞ্জ জেলায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে)

ঘ) ৩৯ টি রেগুলেটর নির্মাণ (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ৬২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯ টি)

ঙ) ১৩৭ টি রেগুলেটর পুনর্বাসন (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ৯ কোটি ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭০ টি)

চ) ৩০টি কজওয়ে নির্মাণ (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ টি)

ছ) ২৯ টি ড্রেনেজ আউটলেট (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ১১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭ টি)

জ) ২২ টি ইরিগেশন ইনলেট (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২ টি)

ঝ) ৩৩৩ কি.মি. খাল নিষ্কাশন (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় ২৫ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২৭.০৩ কি.মি.)

ঞ) ৬৮.১২৫ কি.মি.নদী ড্রেজিং (সুনামগঞ্জ জেলায় ১৮৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৮.১২৫ কি.মি.)

পর্যালোচনায় কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রমের সিংহভাগই সুনামগঞ্জ জেলায় এবং ডিপিপি অনুযায়ী এ কার্যক্রমের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৪৯০ কোটি টাকা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্প শুরু হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত এ অঙ্গসমূহে সুনামগঞ্জ জেলায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬৯ কোটি ৪ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, প্রকল্প শুরু হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি প্রায় ২৬% যা আদৌ প্রত্যাশিত নয়।

৪.৪.১ ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে গৃহীত টেন্ডার কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য

ক) সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরে ২০৮.৭৬৪ কি.মি. ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি (Re-sectioning) করানোর জন্য ৩২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ৮৪ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়। প্যাকেজসমূহ মার্চ ২০১৬-এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। এসব প্যাকেজের কোনটি যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। বরং ক্যারিডওভার হয়ে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করার পরও সমাপ্ত হয়নি। উল্লেখ্য, এ সকল প্যাকেজের বিপরীতে ২০১৫-১৬ সালে ১৫ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয় এবং বর্তমান বছরে ১৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়।

খ) এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলায় ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে ৮০৪.৭৮২ কি.মি. ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতি করার জন্য ৪৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ৭৬ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ দেয়া হয়। প্যাকেজসমূহ মার্চ ২০১৭-এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। এসব প্যাকেজের কোনটি যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। উল্লেখ্য, এ সকল প্যাকেজের বিপরীতে ইতোমধ্যে ৯ কোটি ২১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করা হয়।

উল্লেখ্য, ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের কাজ খুবই ব্যতিক্রমধর্মী, কারণ এটি স্বল্প সময়ে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকে। এই ধরনের ক্যারিডওভারকৃত কাজের কোন ইতিবাচক ফল নেই, যেখানে বন্যার সময় কৃত কাজ তলিয়ে যায় এবং পরের বছর আবার নতুন করে শুরু করতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বিগত বছরের সকল দরপত্রের কাজ সম্পূর্ণ না করাও অনিয়ম ও ধীরগতির প্রমাণ। ৬টি জেলার টেন্ডারের কাজের ২০১৫-১৬ সালের ক্যারিডওভারকৃত ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের চলমান কাজসমূহের দরপত্রের বিবরণী পরিশিষ্ট-১৬ এ দেখানো হলো। সার্বিক কর্মকাণ্ডে প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনিয়ম, ধীরগতি ও গাফিলতি লক্ষ্যণীয়।

৪.৪.২ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন হাওরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের কাজের উপর সুশীল সমাজ ও হাওর এলাকার জনসাধারণের অভিযোগ ও মতামত নিম্নরূপঃ-

ক) পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারদের কাজ কোন বছরই সময় মত শুরু হয় না এবং শেষও হয় না।

খ) ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন হয় না এবং ডিজাইন সম্পর্কে সুশীল সমাজ ও উপকারভোগী জনসাধারণকে কোন ধারণা দেয়া হয় না বা তাদের সম্পৃক্ত করা হয় না।

গ) বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে কোন কম্পেকশন করা হয় না।

ঘ) বাঁধে কোন ঘাস লাগানো হয় না।

ঙ) পুরানো বাঁধের কাছ থেকে মাটি কেটেই বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়, এতে মূল বাঁধই হুমকির সম্মুখীন হয়।

চ) কোন রকমে সরু আকারের বাঁধ দিয়ে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পানি ঠেকানোর চেষ্টা করে এবং ফসল উঠে গেলে যখন বাঁধ ডুবে যায়, তখন একশত ভাগ বিল করে টাকা ভাগাভাগি করা হয়।

ছ) রিসেকশনিং-এর নামে যেখানে বাঁধের সেকশন ভাল থাকে সেখানেই কাজ নেয়া হয় এবং বাঁধের ঘাস কর্তন করে মাটি কুপিয়ে চাকা ভেঙ্গে দেখানো হয় মাটি ফেলেছেন; বাস্তবে কোন মাটি ফেলা হয় না, বরং ভাল বাঁধকে আরো দুর্বল করা হয়।

জ) রিসেকশনিং -এর নামে ঠিকাদার যে কাজ করে তাতে সেকশন ডিজাইন অনুযায়ী না করা, কম্পেকশন না করা এবং ঘাস না লাগানোর কারণে বর্ষা শেষে সমস্ত লুজ মাটি ধুঁয়ে যায় এবং বাঁধের লেভেল নিচু হয়ে আবার পূর্বের অবস্থাতেই ফিরে আসে, মাঝখানে সরকারী অর্থের অপচয় হয়।

ঝ) সুনামগঞ্জ জেলার বাহিরের যে সকল ঠিকাদার কাজ পায়, তাদের হাওর সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায়, তারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের নিকট কাজ বিক্রি করে দেন এবং কখনই সাইটে আসেন না, বহু হাত বদলও হয়। এছাড়া কাজ বিক্রির দর কষাকষিতে কাজ বাস্তবায়নের মূল সময়ের অনেকটা পার হয়ে যায়। এতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারাও জড়িত।

ঞ) দীর্ঘদিন যাবত পানি উন্নয়ন বোর্ডের একই বিভাগে কর্মরত থাকায় শাখা কর্মকর্তাগণ (এস, ও) নিজেরাই ঠিকাদার-এর কাজ বাস্তবায়ন করেন যা কাম্য নয় এবং এখানে অনিয়মের সুযোগ থাকে।

৫.০ অভিযোগ সম্পর্কে সার্বিক বিশ্লেষণ

তদন্ত কমিটির বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, পিআইসি ও দরপত্রের মাধ্যমে কাজের উভয় ক্ষেত্রেই প্রায় একই ধরনের অভিযোগ লক্ষ্যণীয়। দরপত্রের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, তা হলো ঃ

ক) হাওরের মাটির কাজে সুনামগঞ্জ জেলার বাহিরের ঠিকাদারের অংশগ্রহণ কোনো ইতিবাচক অবদান রাখে না, বরং অহরহ নেতিবাচক প্রভাব রেখে চলেছে।

খ) যে সমস্ত নদী/খাল ভরাট হয়ে গিয়েছে সেগুলো ড্রেজিং/পুনঃখনন করার বিষয়টি সর্বত্র গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া দরকার।

গ) ভরাট হওয়া হাওরসমূহের তলদেশ খনন করে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ঐ স্থানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য ।

ঘ) বোরো চাষে পরিবর্তন আনার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ) যে সকল কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারের গাফিলতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে হাওরবাসীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোরালো দাবী সর্বত্র উত্থাপিত হয়েছে।

চ) উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে বাঁধের কাজ সম্পাদনের বিষয়টি এবং জমি যার বাঁধ তার বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছে।

সাধারণ কৃষক, ভুক্তভোগী, সুশীল সমাজ, সাংবাদিকবৃন্দ যাঁরা কমিটির নিকট লিখিত মতামত ও পেপার কাটিং জমা দিয়েছেন তা পরিশিষ্ট -১৭ ও পরিশিষ্ট-১৮ এ দেখানো হলো।

৬.০ আগাম বন্যার প্রাক্কালে (২৮-৩১ মার্চ ২০১৭) বাপাউবো-র মনিটরিং টিম-এর সুনামগঞ্জ জেলার মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন শেষে পর্যবেক্ষণসহ মতামত

সুনামগঞ্জ পওর বিভাগাধীন বিভিন্ন হাওরের কাবিটা ও এডিপিভুক্ত সম্পাদিত কাজ বাপাউবো'র মনিটরিং টিম দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৩০টি সাইট নির্দিষ্ট করে সরজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রতিবেদনে উল্লিখিত কমিটির কিছু মতামত সার্বিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক) পরিদর্শনকৃত সাইটগুলির কোনটিতে কাজ শেষ হয়নি। এসব এলাকায় আরো কাজ করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। অনুমোদিত নকশা অনুসারে কমপ্যাকশন করা হয়নি, পার্শ্ব ঢাল রাখা হয়নি, বাঁধের টো এর সন্নিকট হতে মাটি অপসারণের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে অথচ অনেকক্ষেত্রে ব্যয় প্রাক্কলনে একাধিক লীড -এর জন্য টাকা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।

খ) ডিজাইনে 150 mm layer by layer compaction with 7 kg Iron hammer বলা আছে এবং সে সাথে এস্টিমেটে মাটির কাজের প্রায় ২১% অর্থের সংস্থান থাকা সত্ত্বেও সকল সাইটে কোন ধরণের compaction দেখা যায় নি। এই আইটেমে ঠিকাদার বা পিআইসিকে কোন অর্থ প্রদান করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। কাজ না করে অর্থ পেলে ঠিকাদার বা পিআইসির মধ্যে কাজ না করার অসুস্থ মানসিকতা তৈরি হয়, তাঁরা আশা করতে থাকে হয়তো এ বছর আগাম বন্যা হবে না এবং তারা অল্প কাজ করে পার পেয়ে যাবেন।

গ) সকল সাইটে Side slope 1:2-এর কাছাকাছিও ছিল না। পরিমাপ করে সাইড স্লোপ ১:১.১ থেকে ১:১.৫ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। স্লোপ স্টিপার থাকার কারণে অনেক জায়গায় পানি আসার পূর্বেই বড় ধরণের ধস দেখা গেছে। হাওর অঞ্চলে যথাযথ স্লোপ মেইনটেইন করা অত্যন্ত জরুরী। অন্যদিকে স্লোপ ঠিকমত না হলে এবং কমপ্যাকশন না করলে Seepage-এর সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়, যা বাঁধ ধসের একটি বড় কারণ।

ঘ) এস্টিমেটে বাঁশ দিয়ে প্রোফাইল বা আইডিয়াল সেকশন তৈরি করার জন্য আইটেম থাকলেও বাস্তবে কোনো সাইটে তা দেখা যায়নি। আইডিয়াল সেকশন থাকলে কাজের অগ্রগতি মনিটর করা অনেক সহজ। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পিআইসির সদস্যরা জানে না বাঁধের ক্রেস্ট কোন লেভেল পর্যন্ত নিতে হবে বা সাইড স্লোপ কোন পর্যন্ত হবে। হাওর অঞ্চলে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য, এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ঙ) চেইনেজের দুর্বলতার কারণে অনেক সময় কাজের স্থান নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। এডিপি ও পিআইসি-এর কাজ অনেক জায়গায় একই স্থানে হবার ফলে চেইনেজ ব্যবস্থাপনায় আরো দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

চ) মার্চ মাসে বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক জায়গায় মাটি পাওয়া দুরুহ হয়ে যাওয়ায় কিছু সাইটে বালি দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হয়েছে যার কারণে ডিজাইনে উল্লিখিত কমপক্ষে ৩০.০% Clay স্পেসিফিকেশনের ব্যত্যয় হয়েছে। বালি দিয়ে তৈরি বাঁধ ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় তা পরিহার করা প্রয়োজন।

ছ) হাওর অঞ্চলে বাঁধের কাজের মনিটরিং ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। শাখা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে অগ্রগতির প্রতিবেদন নেওয়া হয়। তারাও কোন ধরনের পরিমাপ না করে কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন দেন। তাদের ৫০% বা ৬০% অগ্রগতির ব্যাখ্যা বা আইটেমভিত্তিক অগ্রগতি জানতে চাওয়া হলে তারা তা প্রদান করতে পারেননি। আইটেমভিত্তিক অগ্রগতি থেকে খুব সহজেই জানা যাবে কমপ্যাকশন, কেরিড আর্থ বা লিডে অগ্রগতি কেমন ধরা হয়েছে এবং বাস্তবতার সাথে তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জ) হাওর এলাকায় কাজ শেষ করার উপযুক্ত সময় ২৮ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু সময় বর্ধিত করে ৩১ মার্চ করা সত্ত্বেও শেষ সময়ে পিআইসি বা ঠিকাদারদের মধ্যে কাজ শেষ করার কোন প্রবণতা লক্ষ করা যায় নি। একাধিক অসম্পূর্ণ সাইটে কোন লেবার দেখা যায়নি।

ঝ) পিআইসি গঠনের এবং তা বাতিলের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সহজ হওয়া প্রয়োজন। পিআইসির সদস্য মনোনয়নের সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করা দরকার। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মনোনয়ন পাওয়া না গেলে মনোনয়নের ক্ষমতা নির্বাহী প্রকৌশলীর কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাবে এমন নিয়ম থাকা প্রয়োজন।

ঞ) কয়েক হাজার কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বাঁধ মেরামত ও সংস্কার কাজের যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন। বিশেষ করে ভাল ভার্টিক্যাল একুরেসি আছে এরকম জিপিএস প্রয়োজন। দুর্গম হাওর অঞ্চলে সবসময় ফ্লাই করে লেভেল নির্ধারণ করা কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ।

ট) যথাসময়ে মানসম্পন্ন কাজ করার জন্য ঠিকাদার বা পিআইসির ভালো মানসিকতা অত্যন্ত জরুরী। কাজ করার মানসিকতা ততোদিন পর্যন্ত তৈরি হবে না যতোদিন পর্যন্ত কাজ না করে (কমপ্যাকশন, লিড বা কেরিড আর্থ প্রভৃতি) অর্থ পাওয়ার সুযোগ থাকবে। তীর সংরক্ষণমূলক কাজে বাপাউবোর অভাবনীয় সাফল্যের কারণ ঠিকাদাররা জানেন যে, কেবল কাজ করেই অর্থ পাওয়া যাবে। তাদের মানসিকতাও এভাবেই তৈরি, কিন্তু হাওর অঞ্চলের সমস্যা হচ্ছে কাজ শেষ করার সুনির্দিষ্ট সময় কাগজে থাকলেও বাস্তবে নেই। নানা সমস্যার কারণে পানি আসার পর কাজের প্রকৃত অবস্থা কোন কমিটির পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয় না। ঠিকাদার বা পিআইসি এই সুযোগ নেয় এবং তাদের মানসিকতাও এভাবেই তৈরি।

এই পর্যবেক্ষণে প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ শাখা কর্মকর্তাদের অনিয়ম, গাফিলতি, ধীরগতির চিত্র ফুটে উঠেছে।

৬.১ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের বক্তব্য

বিগত ১৮ মে ২০১৭ তারিখে ঢাকাস্থ প্রকল্প অফিসে জনাব আব্দুল হাই, প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), জনাব নুরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) এবং জনাব আবছার উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)-এর বক্তব্য গ্রহণ করা হয় এবং বক্তব্যের

সমর্থনে তাঁরা লিখিত বক্তব্য জমা দেন। প্রত্যেক কর্মকর্তা তাঁর বক্তব্যে নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন। তাঁদের লিখিত বক্তব্য তদন্ত কমিটি কর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.০ কমিটির অন্যান্য পর্যবেক্ষণ

৭.১ কাজের পরিধির তুলনায় জনবলের স্বল্পতা

সুনামগঞ্জ জেলায় উল্লেখযোগ্য হাওরসমূহের মধ্যে ৩৮টি হাওরে, প্রকল্পের মাধ্যমে, বোরো ধান আগাম বন্যা হতে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৯৬২ সাল হতে ২০০৫ সালের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সমাপ্ত হয়ঃ

(ক)	ডুবন্ত বাঁধ	=	১৪৫৭ কিঃমিঃ।
(খ)	অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন খাল	=	৫৮ টি (২৬১ কিঃমিঃ)।
(গ)	স্লুইস/রেগুলেটর	=	৫৬ টি (১-৬ ভেন্ট)।

প্রকল্প সমূহের মোট এলাকা ২,১৭,৮৪৩ হেক্টর এবং আবাদযোগ্য এলাকা ১,৩১,২৮৪ হেক্টর। ২০০৪ এবং ২০১০ সালে আগাম বন্যায় সুরমা নদীর পানি সুনামগঞ্জ অংশে ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম করায় পাকা বোরো ধানসহ প্রায় সবগুলো হাওর পানিতে ডুবে যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০/১১/২০১০ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর সফরকালে সুরমা-বৌলাই নদী সিস্টেম উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হাওর এলাকায় ৬ টি জেলার ৫২ টি হাওর পুনর্বাসন-এর জন্য "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিস্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই ৫২টি হাওরের মধ্যে ৩৬টি হাওরের পুনর্বাসন কাজ এবং প্রতি বছরের কাবিটার মাধ্যমে রুটিন মেরামত কাজ যার মধ্যে ৫১০টি পাবলিক কাট, ২৭০টি স্থানে বাঁধের ভাঙ্গন এবং ৪০টি ক্লোজারের নির্মাণ কাজ সুনামগঞ্জ পওর বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কাজ বাস্তবায়নের সময়কাল মাত্র তিনমাস এবং হাওরগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যাতায়াত ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় ১১টি উপজেলায় বিস্তৃত ৩৮টি হাওরের কাজ একজন নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা খুবই দুরুহ এবং তা বাস্তবসম্মতও নয়। কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে সুনামগঞ্জে দু'টি পরিচালনা ও রক্ষাণাবেক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে যার নমুনা পরিশিষ্ট-১৯ এ দেখানো হলো।

৭.২ ওয়াটার ও রেইন গেজ

পর্যবেক্ষণে কমিটির কাজে দৃষ্টিগোচর হয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায় গেজ মূলত কাজ করেছে একটি, যা সুনামগঞ্জের সদরে অবস্থিত। তাই একটি গেজ থেকে সমগ্র এলাকা পর্যবেক্ষণ সঠিক নয় বলে মনে হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল স্থান হলো মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি এলাকা। উক্ত মেঘালয় রাজ্যের চেরাপুঞ্জি, শিলং এবং আসামের শিলচর ও অন্যান্য স্থানে প্রতিবছর ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ব্যাপক বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পানি সরাসরি সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ভারতের আসাম হতে আগত বরাক নদী সিলেটের অমলশিদ নামক স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা নদী হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং কুশিয়ারা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ভৈরব নদীর পানি প্রবাহ আরো দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের নিকট মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। তাছাড়া সুনামগঞ্জ জেলায় ভারতের মেঘালয় হতে আরও কিছু শাখা নদী, যেমনঃ ধলাই, চিলাই, চলতি, রক্তি, আবুয়া, যাদুকাটা, বৌলাই, কালনী ইত্যাদি নদী বিভিন্ন জায়গায় সুরমা নদীতে পতিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলার অভ্যন্তরীণ কিছু ছোট ছোট নদীও আছে, যেমনঃ নলজুর, মহাসিং, মরা সুরমা, কামারখাল, ধারাইন, পিয়াইন, গাগলাজোড়, পাটনাই, নাইন্দা, কংস ইত্যাদি। ভারতের শিলং, চেরাপুঞ্জি, শিলচর, গুয়াহাটী ইত্যাদি এলাকার বৃষ্টিপাতের প্রায় সমুদয় পানি সুনামগঞ্জের হাওরে এসে পতিত হয়। মেঘালয় রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের বৃষ্টিপাতের কারণে সুনামগঞ্জের একেক নদীতে একেক সময়ে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন নদীতে inflow, আবার কোন নদীতে back flow-এর সৃষ্টি হয়।

৭.২.১ সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলের নদী সমূহের স্রোতধারা unpredictable এবং multi-directional হওয়ায় একেক সময়ে একেক নদীতে একই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের পানি সমতল বিরাজ করে। এই সকল নদীতে গেজ না থাকায় বর্তমানে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর ওয়াটার গেজ-এর ডাটা বিবেচনা করে হাওরসমূহ ডুবে যাওয়ার যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে সমালোচনা শুরু হয়েছে। এ কারণে হাওর অঞ্চলের নদীসমূহের বিভিন্ন স্থানে ওয়াটার গেজ এবং বিভিন্ন উপজেলা পর্যায়ে রেইন গেজের ব্যবস্থা গ্রহণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৭.২.২ ওয়াটার গেজ স্থাপনের সম্ভাব্য স্থান ঃ

১। সুখদেবপুর (বাউলাই বা সুরমা)

২। দিরাই (পুরাতন সুরমা)

৩। জগন্নাথপুর (মরা সুরমা)

৪। মধ্যনগর (সোমেশ্বরী)

৫। আফতাব বাজার (মহা সিং নদী)

৬। দুর্লভপুর (সুরমা)

৭। বড়খালা (পাটনাইগঞ্জ)

৮। দক্ষিণ হাসানপুর(ধনু)

৭.২.৩ রেইন গেজ স্থাপনের সম্ভাব্য স্থানঃ

১। জামালগঞ্জ

২। ধর্মপাশা

৩। তাহিরপুর

৪। দিরাই

৫। শাল্লা

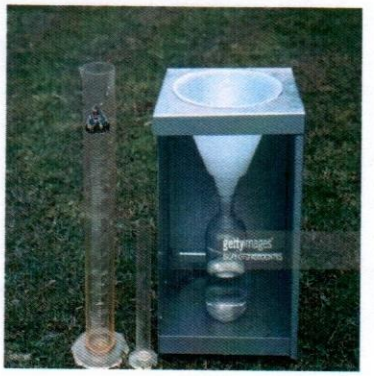

৭.৩ হাওরের বিভিন্ন জোনে লাগসই চাষাবাদের প্রস্তাবনা

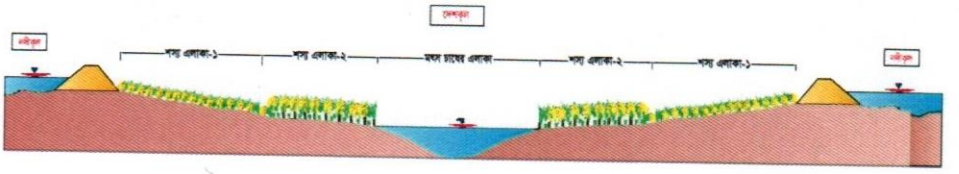

হাওরের সাধারণ প্রস্থচ্ছেদ
(অংকন স্কেলে নেই)

হাওরের সাধারণ কন্টুর ম্যাপ
(অংকন স্কেলে নেই)

শস্যের বৈশিষ্ট্য

শস্য এলাকা-১

জাতের নাম : ব্রি ধান ২৯
গাছের উচ্চতা : গাছের উচ্চতা ৯৫ সেঃ মিঃ।
জীবনকাল : ১৬০ দিন।
বীজ বপন : ১-৩০ নভেম্বর
ফসল কাটা : মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের শুরুপ পর্যন্ত
ফলন : হেক্টর প্রতি ৭.৫ টন।

শস্য এলাকা-২

জাতের নাম : ব্রি ধান ২৮
গাছের উচ্চতা : গাছের উচ্চতা ৯০ সেঃ মিঃ।
জীবনকাল : ১৪০ দিন।
বীজ বপন : ২৫-২৯ নভেম্বর
ফসল কাটা : ৩-১৮ এপ্রিল
ফলন : হেক্টর প্রতি ৫.৫-৬.০ টন।

হাওর এলাকার টেকসই ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে এবং কন্টুর ম্যাপ বিবেচনায় এনে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করা দরকার, যা দিয়ে এই ধরনের আগাম বন্যা বা স্বাভাবিক বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ জরুরী।

৮.০ তদন্ত কমিটি কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন কালে দৃশ্যমান কয়েকটি অসংগতি

৮.১ আঙ্গুরালী হাওর ও শনির হাওর একই নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত। বিগত ০৯ মে ২০১৭ তারিখে নদীর দুই পাড়ের ছবি নেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায়, আঙ্গুরালী হাওরের ডিজাইন ক্রেস্ট লেভেল ৭.২০মি.(PWD) এবং শনির হাওরের ডিজাইন ক্রেস্ট লেভেল ৭.২০মি.(PWD)। একই দিন সুনামগঞ্জের সুরমার পানির লেভেল ছিল ৬.৫২ মি.(PWD)। ১৮ মে ২০১৭ মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী আঙ্গুরালী হাওরের বর্তমান ক্রেস্ট লেভেল ৬.০১ মি.(PWD) এবং শনির হাওরের ডিজাইন ক্রেস্ট লেভেল ৭.৪৬ মি.(PWD)। একই দিন সুনামগঞ্জের সুরমার পানির লেভেল ছিল ৬.০১ মি.(PWD)এবং শনির ও আঙ্গুরালী হাওর-এর কাছে পানির লেভেল ছিল ৫.২৬ মি.(PWD)। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত কাজে একটি হাওরের সাথে পাশাপাশি আর একটি হাওরের কোন সামঞ্জস্য নেই। কাজ বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীনতা ছাড়াও মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের মনিটরিং-এর অভাব ফুটে উঠেছে।

৮.২ দুর্বল এবং ক্ষতিগ্রস্থ সেকশনে কাজ না করে ভাল সেকশনে কাজ করার যে অভিযোগ তারই প্রমাণ মিলে নিচের ছবি-১ , ২, ৩ ও ৪ এ।

আংগুর আলী হাওর (ছবি-১)

শনির হাওর (ছবি-২)

হাইজদা হাওর (ছবি-৩)

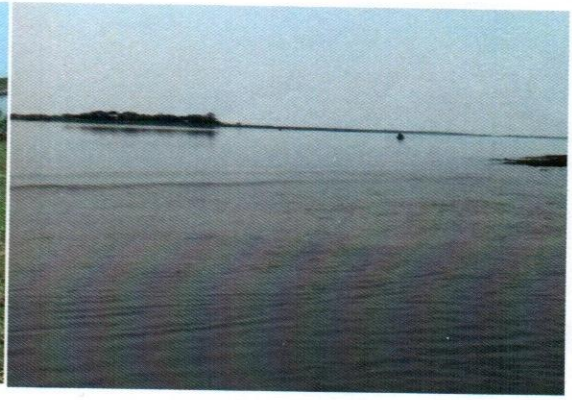

খালিয়াজুরী পোল্ডার (ছবি-৪)

৮.৩ সমন্বয়হীনতার অভাব

পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, মাঠ প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি এবং জনগণের সাথে পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কর্মকর্তাদের মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

৮.৪ ঠিকাদার নির্বাচন

কাজ নিয়ে বারবার ব্যর্থ ঠিকাদারদের নিয়মিত উপস্থিতি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুনাম ক্ষুন্ন করেছে। নামে-বেনামে চেনামুখের ঠিকাদার কাজ পাচ্ছেন এবং মাঠপর্যায়ে কাজে গাফিলতি করছেন, তা স্থানীয় জনগণ বারে বারে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। বিপর্যয়ের মুখেও ঠিকাদারদের বাঁধের কাছে পাওয়া যায়নি। সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাদের উপস্থিত করাতে পারেননি। ইউএনও, বিশ্বম্ভরপুর জানিয়েছেন, তৃতীয়বার ডাকার পর ঠিকাদার একজন শ্রমিক-সর্দারকে পাঠিয়েছেন। উন্নয়ন প্রকল্পে ঠিকাদারের মাধ্যমে যে সকল কাজ করা হয়েছে বা হওয়ার কথা ছিল, সে ক্ষেত্রে অভিযোগ সবচেয়ে বেশি। অনেকে কাজ নিয়ে কোন কাজই শুরু করেন না এমন উদাহরণও রয়েছে। যেমনঃ

সুনামগঞ্জ জেলার ৬টি হাওরে নিয়োগকৃত ঠিকাদারদের কাজ শুরু না করার তথ্য এবং বিগত ৩১.০৩.১৭ তারিখে পানি-সমতল ও বাঁধ Over top করা সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	হাওরের নাম	ঠিকাদারের নাম	কাজের অবস্থান (কিঃমিঃ)	বাঁধের Top Level মিঃ (PWD)	ডিজাইন লেভেল মিঃ (PWD)	কলাম-৫ ও কলাম-৬ এর পার্থক্য (মিঃ)	৩১.০৩.১৭ তারিখে পানি সমতল মিঃ (PWD)	বাঁধ Over top করার তারিখ (মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	মাতিয়ান হাওর	মেসার্স গুডম্যান এন্টারপ্রাইজ	২৩.৪০	৪.৫০	৬.৭০	২.২	৪.৬০	৪ এপ্রিল ২০১৭
২।	ঐ	মেসার্স খন্দকার শাহীন আহমেদ	০.৫৮	৪.৮০	৭.০০	২.২	৪.৬০	ঐ
৩।	নাইন্দিয়ার হাওর	ঐ	০.৩০	৫.৪৬	৮.৫০	৩.০৪	৫.৬৮	১ এপ্রিল ২০১৭
৪।	ঐ	ঐ	৪২.৪২	৬.৬২	৮.৫০	১.০৮	৫.৬৮	ঐ
৫।	খাই হাওর	ঐ	১৬.৫০	৫.৫১	৬.৫০	০.৯৯	৫.৬৮	৬ এপ্রিল ২০১৭
৬।	গুরমার হাওর	সজীব রঞ্জন দাশ	২০.৫০	৫.৪০	৬.৫০	১.১০	৫.৪২	১ এপ্রিল ২০১৭
৭।	টাংগুয়া হাওর	মাহীন কনস্ট্রাকশন	২১.৩৩	৪.১৫	৬.৬০	২.৪৫	৪.৩৭	২ এপ্রিল ২০১৭
৮।	ঘোড়াডোবা হাওর	সজীব রঞ্জন দাশ	১৮.৪৭	৩.২৭	৬.৫০	৩.২৩	৩.৪২	৪ এপ্রিল ২০১৭
৯।	টাংগুয়া হাওর	মেসার্স খন্দকার শাহীন আহমেদ	২.৭৭২	৪.৪০	৬.৬০		৪.৩৭	২ এপ্রিল ২০১৭

৮.৫ উপরোক্ত ছক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৬টি হাওরের বাঁধগুলোর টপ লেভেল, ডিজাইন লেভেলের নিচে হওয়ার কারণে ৩১ মার্চ (কলাম-৮) এর মধ্যে হাওরগুলো ডুবে যাওয়ার কথা কিন্তু মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য (কলাম-৯) মোতাবেক ১ এপ্রিল থেকে ৪ এপ্রিলের মধ্যে হাওরগুলো ডুবে যায়। ছকের কলাম-৫ এ প্রদর্শিত বাধের টপ লেভেল এবং কলাম-৮ এ প্রদর্শিত পানির লেভেলের তথ্যের মধ্যে গরমিল রয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, ৬টি হাওরের কার্যাদেশ প্রদানে বাঁধগুলোর টপ লেভেলের যে তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। দরপত্র আহবানের পূর্বেই প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য বাস্তবের চেয়ে কম দেখানো হয়েছে। ফলশ্রুতিস্বরূপ ঠিকাদারদের কম কাজ করে অধিক অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য উল্লেখের ক্ষেত্রে এরূপ গরমিল প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদাসীনতা, সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে গাফিলতির পর্যায়ভুক্ত।

৯. প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর সার্বিক বিশ্লেষণের সার-সংক্ষেপ

ইতঃপূর্বে যে তথ্যাদি আলোচিত হয়েছে, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সরেজমিনে তদন্তকালে যে মতামত পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে সার্বিক বিশ্লেষণের সার-সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) সুনামগঞ্জসহ হাওর অধ্যুষিত ছয়টি জেলায় ব্যাপক ফসলহানি ঘটেছে। এই দুর্যোগের কারণ একই সাথে প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সাধারণ বর্গাচাষী থেকে শুরু করে বহু জমির মালিক একবাক্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে দোষারোপ করেছে। এবারের ফসলহানি ঘরে ঘরে সংকট ডেকে এনেছে। সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শিবাহী

সাহা'র কথায় তার চিত্র পাওয়া যায়ঃ 'হাওরের একজন বউ আমি, আমার স্বামী কৃষক, আমাদের একটি মেয়ে আছে, আমার মত আগাম বন্যায় হাজার হাজার কৃষক যখন বন্যায় ভাসে তখন চোখের জল মানে না'। যদিও এই আগাম বন্যার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড দায়ী নয়, তথাপি উপকারভোগীর ভাষ্য হচ্ছে, সময়মত ও সুষ্ঠুমত বাঁধের কাজটি যদি পানি উন্নয়ন বোর্ড করতো, তাহলে তাদের দোষারোপ কেউ করতো না।

(খ) তদন্তে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত ডিজাইন অনুসারে কাবিটা ও ঠিকাদারী কাজ সম্পন্ন হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে কাজই শুরু হয়নি। তাই কেবল আগাম বন্যা ও বিপদসীমার উপর পানি প্রবাহের কথা উল্লেখ করে পুরো বিষয়টিকে আড়ালে নেয়া যায় না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় কৃষকদের কোন আস্থাই অর্জন করতে পারেননি। স্থানীয়দের অভিমত, শয়তান খালি ক্লোজার না করার কারণে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ধর্মপাশার চন্দ্রসোনার থাল হাওরে পানি প্রবেশ করে।

(গ) সুনামগঞ্জসহ হাওর এলাকায় আগাম বন্যা বা ঢল প্রতিরোধে বাঁধ মেরামত ও সংস্কার সংক্রান্ত মাটির কাজের যে কার্যক্রম, তা পুরো পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমগ্র কাজের তুলনায় একটি অংশ মাত্র। সিলেট অঞ্চলের প্রধান প্রকৌশলীর নিয়ন্ত্রিত হাওর অঞ্চলের ০৬ (ছয়) টি জেলার মাটির কাজ বাস্তবায়নে নীতিমালা অনুসরণ না করা, নিয়মিত মনিটরিং না করা, সময়মত কাজ শুরু না করার বিষয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ এই একটি অংশের কাজের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের মত একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুনামের মারাত্নক ক্ষতি হয়েছে, একইসাথে সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়েছে। এই দায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালক এড়িয়ে যেতে পারেন না। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যে তিনজন প্রকৌশলীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে, তা সময়োচিত পদক্ষেপ বলে ভুক্তভোগীগণ আমলে নিয়েছেন। একই সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণও এই ধীরগতি বা গাফিলতি বা কাজ না করার জন্য দায়ী।

(ঘ) যে নীতিমালা অনুসরণ করে পিআইসি কমিটি গঠন করা হয় তা বাস্তবতার নিরিখে সংশোধনযোগ্য। তদুপরি পিআইসি গঠনে বিলম্ব ঘটেছে। পুরো নীতিমালা পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং স্থানীয়ভাবে যে দাবী উঠেছে 'জমি যার বাঁধ তার'-তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

(ঙ) পিআইসি গঠন ও তার কার্যক্রমের চেয়ে ঠিকাদারী কার্যক্রমই সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। যথাসময়ে টেন্ডারে কার্যাদেশ দিতে না পারা ও বাস্তবে ঠিকাদারদের উপর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা এবং ঠিকাদারদের অবহেলা কৃষকদের যেমন সর্বনাশ করেছে, তেমনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুনামকে ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন করেছে। এই ঠিকাদারী প্রক্রিয়াকে নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। হাওর এলাকার কাজ বিশেষ এলাকার ও বিশেষ ধরনের কাজ এবং স্থানের (Place) সাথে সময়ের সম্পর্ক এখানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সম্পূর্ণ Time bound কাজকে ভিন্নভাবে ও বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিতে বিবেচনার দাবী রাখে। স্থানীয় জনগণ ঠিকাদারী প্রথার পুরো বাতিল চেয়েছেন, যা প্রণিধানযোগ্য। স্থানীয় জনগণ উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে ও জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে কাজটি সম্পাদিত হোক, এমন দাবী করেছে যা বিবেচ্য।

(চ) এবারের বিশ্ব পানি দিবসের শ্লোগান ছিল ঃ নদী খাল খনন কর, বাংলাদেশ রক্ষা কর। হাওরের জন্য এই শ্লোগান বেশি বিবেচ্য হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রতিফলন নেই। এই আগাম বন্যা যে কোন বছরই হতে পারে। তাই একজন সাধারণ কৃষক থেকে নদী গবেষক সবাই একবাক্যে বলেছেন ঃ হাওর এলাকার নদীসমূহ খননের কোন বিকল্প নেই। একই সাথে বিভিন্ন হাওরের তলদেশ ভরাট হবার কারণে তাও খনন করা প্রয়োজন। এই খনন বিচ্ছিন্নভাবে করলে কোন ফল আসবে না। উজান থেকে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহ খনন করলেই কেবল ইতিবাচক ফল আসবে।

(ছ) বর্তমানে যে বোরো ফসলের চাষ হয় তা পরিপক্ক হতে দীর্ঘ সময় নেয়, তাতে আগাম বন্যা বা ঢলে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে। এই জুয়া খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে এককভাবে দায়িত্ব দিলে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না। সেজন্য টেকসই বীজের উদ্ভাবন প্রয়োজন। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে। তবে তাতে সময়ের দরকার হবে। এটি প্রণিধানযোগ্য যে, কৃষকদের স্থানীয় জাতের বা ট্রাডিশনাল জাতের বোরো ফসলে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় লাভ নেই। কারণ, এতে যে ফসল হবে তাতে খরচ উঠবে না। বিকল্প ফসলের ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট স্ট্যাডি অপরিহার্য।

(জ) সুনামগঞ্জসহ ৬টি জেলার হাওর অধ্যুষিত অঞ্চল বর্তমানে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের (সিলেট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত। একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় একজন প্রকল্প পরিচালকের অধীনে যে কার্যক্রম পানি উন্নয়ন বোর্ড নিয়েছে তা সঠিক হয়নি বলে বাস্তবে প্রমাণ মিলেছে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ছোট ছোট প্রকল্প নিলে সুফল বেশি পাওয়া যাবে। সর্বোপরি হাওর অঞ্চলকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বন্যা প্রতিরোধসহ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য যেমন পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ড আছে, তেমনি কার্যক্রম গ্রহণ হাওর এলাকায়ও জরুরী। হাওর ও জলাভূমি অধিদপ্তরের কার্যপরিধির মধ্যে এই ধরণের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত নয়।

(ঝ) হাওর এলাকার বাঁধ নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি কার্যক্রম যে পিআইসি বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে করা হয়, তা সবই মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আবর্তিত। কিন্তু যেখানে ফসল রক্ষা মূল উদ্দেশ্য এবং যার মাধ্যমে দেশের শস্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়, সেখানে ঠিকাদার বা পিআইসি'র লাভজনক কার্যক্রমের বাইরে এসে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে এটি সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। এজন্য উপজেলা পরিষদকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে।

(ঞ) হাওর এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে কার্যক্রম চলে, সেজন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শক্তিশালী মনিটরিং প্রয়োজন। সুনামগঞ্জসহ ৬টি জেলায় এই মনিটরিং ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বাপাউবো'র মনিটরিং টিমের (২৮-৩১ মার্চ, ২০১৭ সালের) প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের সিংহভাগ বাস্তবায়নে জড়িত নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা এস.ও গণ। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কাজের গুণগতমান ও কার্যক্রমের মনিটরিং ছিল না বললেই চলে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের ধীরগতিরোধ করা বা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কিংবা প্রধান প্রকৌশলী বা প্রকল্প পরিচালক কেউ করেননি। তদুপরি এ প্রকল্প অফিসটি ঢাকাস্থ মতিঝিলে অবস্থিত। হাওর অঞ্চলের বিশেষ ধরণের কাজের জন্য যে কমিটমেন্ট দরকার, তা মাঠ পর্যায়ে বরাবরই অনুপস্থিত ছিল। বিশেষ করে ক্যারিডওভার কাজ হাওর এলাকার জন্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি কোন বিধিসম্মত পদক্ষেপও নয়। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

(ট) যে নকশা অনুসারে বর্তমানে হাওর অঞ্চলে কার্যক্রম চলেছে, তা বাস্তব অবস্থার নিরিখে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। এছাড়া নকশা অনুযায়ীও কাজ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। বিভিন্ন হাওরের জন্য নকশার বিভিন্নতা থাকার বিষয়টি বিবেচ্য।

(ঠ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের দরপত্র আহবান, কার্যাদেশ প্রদান এবং গুণগতমানবজায় রেখে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নকরণ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কিন্তু এক্ষেত্রে কার্যাদেশোত্তর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজ বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা, এমনকি ১৪২টি (সুনামগঞ্জ-৮৪ টি, সিলেট-১২ টি, হবিগঞ্জ-২টি, মৌলভীবাজার-৪টি, নেত্রকোনা-৩৫ টি, কিশোরগঞ্জ-৫টি) ক্যারিডওভার প্যাকেজের কাজ এ বছরেও শতভাগ সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও দরপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের গাফিলতির সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া সুনামগঞ্জ জেলার ৬টি হাওরের ৯টি প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু না করার পরেও কার্যাদেশ বাতিল না করা, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে।

(ড) তদন্তকালে জানা যায় যে, হাওর এলাকায় চলমান কাজে শত-শত কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রকৃত তথ্য হলো, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে 'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন' প্রকল্পটির অনুকূলে মূল এডিপি-তে ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, তন্মধ্যে দুই কিস্তিতে ৪০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। পরবর্তী সময়ে আরএডিপি (RADP)-তে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ১০০ কোটি টাকা করা হয়। আগাম বন্যার প্রেক্ষিতে কার্যক্রম সমাপ্ত করা যাবে না বিধায় বাপাউবো'র এবং মন্ত্রণালয়ের পুনঃ উপযোজন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ আরএডিপি'র বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা হতে হ্রাস করে ৪০ কোটি টাকা নির্ধারণ করে। ছাড়কৃত ৪০ কোটি টাকা হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২২ কোটি ৪২ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ ৯ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, সিলেট ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, হবিগঞ্জ ২২ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, মৌলভীবাজার ০.০০ কোটি টাকা , নেত্রকোনা ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, কিশোরগঞ্জ ০.০০ কোটি টাকা)।

(ঢ) এছাড়া ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাজস্ব বাজেট হতে কাবিটা কাজের জন্য সুনামগঞ্জসহ ৬টি জেলায় মোট ১৯ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা অবমুক্ত করা হয় (তন্মধ্যে সুনামগঞ্জ ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, সিলেট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, হবিগঞ্জ ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, মৌলভীবাজার ৪৫ লক্ষ টাকা, নেত্রকোনা ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, কিশোরগঞ্জ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা)।

(ণ) ৬টি জেলায় কাবিটা কাজের মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৫ কোটি ৭৫ লক্ষ ৪৯ হাজার কোটি টাকা। (সুনামগঞ্জ ১১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, সিলেট ১ কোটি ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, হবিগঞ্জ ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, মৌলভীবাজার ২১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, নেত্রকোনা ৬৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, কিশোরগঞ্জ ৬৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা)।

(ত) বর্ণিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬টি জেলায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প ও কাবিটা কাজে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৩৮ কোটি ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা।

১০. সুপারিশ ও মতামত

সরেজমিনে পরিদর্শন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে দরিদ্র হাওরবাসীর সাথে সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট অফিস ও প্রকল্প অফিসের নথিপত্র পরীক্ষা, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাদের বক্তব্য, জেলা প্রশাসন ও বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিবেদন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেয়া তথ্য, বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং কমিটির নিকট প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি, কমিটির কার্যপরিধির আওতায় থেকে, তদন্ত কমিটি সার্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশ ও মতামতসমূহ সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে ঃ

(ক) হাওর এলাকার জন্য অবিলম্বে একটি সমন্বিত ও ব্যাপক স্ট্যাডি করা প্রয়োজন। বিশেষ এলাকায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিচাষের লক্ষ্যে এবং প্রকৃতির সাথে লড়াই করার জন্য কি দরকার, তা বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান ছাড়া হাওর এলাকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব নয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দু'টি নির্ভরযোগ্য ট্রাস্ট IWM (Institute of Water Modiling) ও CEGIS (Center for Environmental and GeographicInformation System) কে এই বিজ্ঞানভিত্তিক স্ট্যাডির দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে এবং dedicated প্রকল্প নেয়া যেতে পারে। অথবা চলমান আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প সংশোধন করেও তা করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই স্ট্যাডির অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা এবং সেমিনার ও ওয়ার্কশপ রাখা যেতে পারে।

(খ) সুনামগঞ্জসহ ৬টি জেলায় ব্যাপক ফসলহানির প্রেক্ষিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক যে তিনজন প্রকৌশলী (প্রধান প্রকৌশলী জনাব আবদুল হাই, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব নুরুল ইসলাম সরকার ও সুনামগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব আফসারউদ্দিন)-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে তা যথাযথ বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, তাঁদের কাজে গাফিলতি, ধীরগতি তথা অদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মোকদ্দমার প্রয়োজনে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের জন্য আরো তথ্য সংগ্রহ করা জরুরী। কারণ, তাঁদের কাজের গাফিলতি ও ধীরগতি তথা অদক্ষতা পাওয়া গেলেও কী ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে তাঁরা জড়িত তা বর্তমানে ভরা বর্ষা মৌসুমে সরেজমিনে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এজন্য আগামী নভেম্বরে যখন পানি সরে যাবে, তখন আবার সরেজমিনে তদন্ত করে পুনরায় তথ্য নেয়া দরকার। সেজন্য বর্তমান কমিটির বাইরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়ারপো, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে আর একটি কমিটি'র মাধ্যমে সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন নেয়া যেতে পারে। সেই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই এই তিনজন প্রকৌশলীসহ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও সেকশন অফিসার যারা এই ধীরগতি, গাফিলতি ও দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় মোকদ্দমা রজু করা যেতে পারে। একই সাথে ইতোমধ্যে যাদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, তা অব্যাহত রাখা এবং দীর্ঘদিন সুনামগঞ্জসহ ০৬ (ছয়) টি জেলায় কর্মরত সকল উপ-বিভাগীয়

প্রকৌশলী ও সেকশন অফিসারদের মাঠ পর্যায় থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা যেতে পারে। আলোচ্য ফসলহানির জন্য সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে যে কমিটি করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে, সেই প্রতিবেদনও বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

(গ) যে সকল ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তাদেরও বিধি মোতাবেক শাস্তির আওতায় আনা জরুরী। শুকনো মৌসুমে প্রস্তাবিত কমিটির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠিকাদারদের সকল বিল প্রদান বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঘ) 'নদী খাল খনন কর, বাংলাদেশ রক্ষা কর'-বিশ্ব পানি দিবসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এই শ্লোগানের সূত্র ধরে সুনামগঞ্জসহ হাওর অধ্যুষিত ৬টি জেলায় নদী, খাল ও হাওরসমূহে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা যেতে পারে। বর্তমানে যে খণ্ডিতভাবে খনন চলছে, তা পরিত্যাগ করে উজান থেকে শুরু করে এই খনন কাজ ব্যাপকহারে করা দরকার। এজন্য চলমান 'হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প সংশোধন করে অথবা নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক তা করা যেতে পারে। এই উদ্যোগের আওতায় সুনামগঞ্জের আবুয়া, নান্দিয়াগাঙ, পাটনাই গাঙ, নলজুড়ি, সোমেশ্বরী, পিয়াইন, মহাসিংসহ বহুল আলোচিত রক্তি, যাদুকাটা, আপার বৌলাই ও মরা সুরমা এবং মৌলভীবাজারের জুরী ও সোনাই নদী খননের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তবে ব্যাপক খননের আগে IWM বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্ট্যাডি করে নেয়া অপরিহার্য। এ ব্যাপারে BUET-এর IWFM-এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি নদী খনন কাজের স্থায়িত্ব মূল্যায়নের জন্য নদী সমূহের বিশদ Morphological সমীক্ষা দরকার। উল্লেখ্য, ড্রেজিং-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বালু/কাদা/সিল্ট, স্থানীয় বাজার/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গ্রাম রক্ষার দেয়াল প্রভৃতি কাজে লাগানো যেতে পারে।

(ঙ) যদিও পিআইসি ও ঠিকাদারী কাজ উভয়ক্ষেত্রেই সমালোচনা রয়েছে, তথাপি এর ভিতর পিআইসি'র মাধ্যমে কাজ বেশি লাগসই এবং এতে জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে। পিআইসি'র মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম উপজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন। উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত মাটির কাজ প্রয়োজনে CCEA/CCGP অনুমোদনক্রমে DPM-এর মাধ্যমে তা সম্পাদন করা যেতে পারে।

(চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত নদী/খাল পুনঃখননের জন্য প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন নীতিমালা'র আমূল সংস্কার একান্ত অপরিহার্য। জমি যার বাঁধ তার-এই প্রতিপাদ্য নিয়ে নীতিমালা প্রস্তুতকৃত হওয়া সময়ের দাবী। পিআইসি কমিটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট হতে পারে এবং এই ৫ জন সদস্য, সংশ্লিষ্ট বাঁধের সাথে সম্পৃক্ত যাঁদের জমি আছে, আবশ্যিকভাবে কেবল তাঁদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতে পারে। উপজেলা কৃষি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিসের সহায়তা নিয়ে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই সদস্য নির্বাচন করতে পারেন। এই নির্বাচনের ভিত্তি হতে পারে যার যত জমি বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন।

(ছ) বাঁধের বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত নকশা (Standard Design)-এর মূল্যায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয়দের চাহিদা, বৃষ্টিপাতের রেকর্ড, মাছের প্রজনন সময় (সম্ভাব্য সময় ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে), ফসল পাকার সময় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণ ও স্ট্যাডি করে বাস্তবসম্মত একটি নকশা উদ্ভাবন করা যেতে পারে, যা একই ধরণের বা প্রমিত না হয়ে হাওরের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অনুসারে হওয়া প্রয়োজন। এজন্য জরিপ করা এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা জরুরী। একই সাথে সার্বিক পরিকল্পনায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

(জ) এ বছর ফসলহানি শতভাগ হওয়ার কারণে কৃষকদের অধিকতর সুবিধা দেয়া যেতে পারে। বন্যা/ঢলের পানি তাড়াতাড়ি নির্গমনের ব্যবস্থার বিষয়টি জরুরীভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ঝ) হাওর এলাকায় আরো ওয়াটার ও রেইন গেজ স্থাপন করা এবং পাশাপাশি যথাযথ তদারকির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(ঞ) ছোট-বড় সকল হাওর রক্ষা করা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্বল্প জনবল দিয়ে অসম্ভব বিধায় যে সকল বড় হাওর রয়েছে, যেমন-শনির হাওর, করচার হাওর, দেখার হাওর ইত্যাদির প্রতি বেশি নজর দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ট) হাওর অঞ্চলে শতভাগ ফসলহানির জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুনামের বিশাল ক্ষতি হয়েছে। প্রকৃতির খেয়াল-খুশির হাত থেকে রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড কিছু স্মরণীয় কাজ করতে পারলে এই অবস্থার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে। সে প্রেক্ষিতে প্রকৃতির লীলাখেলা থেকে লক্ষ লক্ষ হাওরবাসীকে রক্ষাকল্পে একটি টেকসই-লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। গৌরবময় অনিশ্চয়তা ক্রিকেট খেলার অংগ হলেও হাওরবাসীর জন্য প্রকৃতির লীলাখেলা থেকে পরিত্রাণ আনার বিজ্ঞানমনস্ক উদ্যোগ নেয়ার কোন বিকল্প নেই।

(ঠ) স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট বোরো ধান উদ্ভাবন ও তা চাষ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। একই সাথে স্বল্পমূল্যে বীজ ও সার প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্যও কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

(ড) শুধু ধান চাষ বা একটি ফসলের উপর নির্ভরতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে অন্য অর্থকরী কার্যক্রম, ভিন্ন ফসল উৎপাদন, বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সামাজিক সু-রক্ষা কর্মসূচি নেয়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করার জন্য বেজা'কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

(ঢ) নদীর বাঁধের উচ্চতা, নদীর Confinement effect-এর উপর অনেকাংশে নির্ভর করে বিধায় নতুন বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে Mathematical Modelling প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাঁধের উচ্চতা নির্ণয় করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ণ) বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনামগঞ্জ জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের দু'টি বিভাগ গঠন এবং কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় একটি উপ-বিভাগ স্থাপনের উদ্যোগসহ পর্যাপ্ত জনবল, বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে কাজের সময় জনবল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এছাড়া এসব জেলায় বিদ্যমান অফিসসমূহ হাওর এলাকার নিকটবর্তী উপজেলা সদরে স্থাপন/স্থানান্তর করা যেতে পারে।

(ত) সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিশ্বম্ভরপুর থেকে নিয়ামতপুর বাঁধ মেরামত ও সংস্কার এবং একই সাথে পার্শ্ববর্তী রূপসা নদী খনন করে সিল্ট এই বাঁধের কাজে লাগানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি, করচার হাওর অধ্যুষিত বিশ্বম্ভরপুরবাসীর ও উপজেলা প্রশাসনের বিশেষ নিবেদন যা বিবেচনাযোগ্য।

(থ) হাওর এলাকায় প্রাকৃতিক জলাধার তৈরির লক্ষ্যে আগাম বন্যার পানি ধারণের জন্য নিচু ও কম গুরুত্বপূর্ণ হাওরগুলোকে বাছাই করে স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত রাখা যেতে পারে।

(দ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মিছেখালিতে বিএডিসি'র নির্মিত রাবার ড্যাম এবং হাওর এলাকায় এলজিইডি'র কয়েকটি রাবার ড্যাম নির্মাণের উপর আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জরুরী ভিত্তিতে করা যেতে পারে।

(ধ) হাওরে ইঁদুরে বাঁধ নষ্ট করা বা ভুরঙ্গা আতঙ্ক, মাছের জন্য রাতের আঁধারে বাঁধ কাটা, করচ-হিজল-বরুণ গাছ লাগানোর সুফল, মাছ চাষ ও জমিচাষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা, পানি পুঁজিপতিদের (Water Lord) হাত থেকে জেলে ও কৃষকদের রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় জনগণকে সঠিক তথ্য দিয়ে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে পানি উন্নয়ন বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(ন) পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থাকে জোরদার করা এবং জনগণের কাছে তা অবহিতকরণ করা, সেজন্য স্থানীয় রেডিও'র ব্যবহার ভালো পন্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। আগাম বন্যার পূর্বাভাস এসএমএস, এ্যাপস ইত্যাদির মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হাওর অধ্যুষিত এলাকায় বাঁধ ও বন্যা, বিশেষ করে আগাম বন্যা ও বৃষ্টিপাতের অবস্থার অন-লাইন মনিটরিং-এর জন্য একটি হাওর মনিটরিং সফটওয়্যার ডেভেলপ করা যেতে পারে।

০৮/৬/১৯

(.....)
হাওলাদার জাকির হোসেন
উপ-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি

০৮/০৬/২০১৯

(.....)
কাজী তোফায়েল হোসেন
চীফ মনিটরিং
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি

০৮.৬.১৯

(.....)
মোঃ খলিলুর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি

(.....) ৮/৬/২০১৯

কাজী ওবায়দুর রহমান
যুগ্ম-সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য, তদন্ত কমিটি

(.....) ০৮.০৬.২০১৯

মন্টু কুমার বিশ্বাস
যুগ্ম-প্রধান
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
সদস্য সচিব, তদন্ত কমিটি

(.....) ৮.৬.২০১৯

ড. মোহাম্মদ আলী খান, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
আহবায়ক, তদন্ত কমিটি